প্রথম অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের নৃ-গোষ্ঠীগত ও ঐতিহাসিক পরিচয়

উত্তরবঙ্গ এবং নিম্ন অসমের অন্যতম জনগোষ্ঠী রাজবংশী জনসমাজ। অসমে এই জনগোষ্ঠী কোচ-রাজবংশী হিসাবে পরিচিত। উত্তরবঙ্গে রাজবংশীরা ক্ষত্রিয় হিসাবে সমধিক পরিচিত। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও (রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, টাঙ্গাইল, রাজশাহী) এই জনগোষ্ঠীর বসবাস। পাশাপাশি নেপাল (ঝাপা, মোরং, ভদ্রপুর), ভুটানের বেশ কিছু অংশেও রাজবংশীদের অবস্থান। এছাড়াও বিহার, মেঘালয়, ত্রিপুরাতেও রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মানুষ সুদীর্ঘ কাল ধরে বসবাস করছেন। সুপ্রাচীন ঐতিহ্য-পরম্পরা ও লোকায়ত ভুবনের অধিকারী এই জনগোষ্ঠী প্রাক্-ঐতিহাসিক কাল ধরেই এইসব এলাকার আদি অধিবাসী।

রাজবংশী জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি নিয়ে বহু বিতর্ক ও মতামত আছে। অনেকের মতে রাজবংশী জনসমাজ মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠী বা বৃহত্তর বোড়ো জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত। খ্রিস্টপূর্ব দশম শতাব্দীর কোনও এক সময়ে ইন্দো-মঙ্গোলয়েড জনপ্রবাহ ভারতে বিস্তার লাভ করে। এই জনগোষ্ঠী অসম, উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, উত্তর বিহার এবং হিমালয়ের সানুপ্রদেশ নেপাল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বখতিয়ার খিলজির তিব্বত আক্রমণের সময় লক্ষ্মণাবতী ও তিব্বতের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড পর্বতময় ও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। আর এখানে সেই সময় ইন্দো-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর কোচ, মেচ, থারু জনজাতির বসবাস ছিল। চ্যাপ্টা নাক, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ চোয়াল, ক্ষুদ্র চোখ ও ভ্রূ ইত্যাদির গড়ন দেখে তিনি এদের বৃহত্তর বোড়ো পরিবারের সদস্য হিসাবে আখ্যায়িত করেন।[১] ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, রাজবংশী জনগোষ্ঠী মঙ্গোলীয় নৃ-জাতির তিব্বত-ব্রহ্মদেশীয় ভাষা-শাখার অন্তর্ভুক্ত হলেও আর্যভাষা সংস্কৃতির প্রভাবে পরবর্তীকালে ভিন্ন ভাষা গ্রহণ করে।[২] ত্রয়োদশ শতকে বৃহত্তর বোড়ো গোষ্ঠী বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে অসম সহ উত্তরবঙ্গে পাকাপাকি ভাবে বসবাস করতে শুরু করে এবং বিস্তৃত অংশ জুড়ে এক বিরাট রাষ্ট্রও গড়ে তোলে। অসমের পূর্বসীমা থেকে বাংলার

উত্তর ভূ-খণ্ডের করতোয়া নদীর পূর্ব তীর অবধি এদের অবাধ বিচরণ ছিল। এদেরই একটি শাখা রাজবংশীতে আখ্যায়িত হয়।

কোচ-রাজবংশের উত্থান, তাদের আনুকূল্য-অনুগ্রহ-প্রভাব, ব্রাহ্মণদের আগমন, আর্যায়নের ঢেউ ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রক্রিয়ার ঘাত-প্রতিঘাতে রাজবংশী হিন্দু জাতিতে পর্যবসিত হয়। তবে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ও স্বতন্ত্রতা নিয়ে বিদ্বজ্জন, গবেষক, নৃতত্ত্ববিদেরা ঐক্যমতে পৌঁছতে পারেননি। অনেক বাদ-বিবাদ, যুক্তি-বিযুক্তি অতীতেও ছিল, এখনও আছে। বরং বলা যায়, রাজবংশী জনসমাজ তাদের জাতিসত্তার প্রকৃত পরিচয় উন্মোচনে যেমন উদগ্রীব, তেমনই নিজেদের এক স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে ভাবতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে ক্ষত্রিয়করণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েও রাজবংশী সমাজের একটা অংশ বৃহত্তর বাঙালি সংস্কৃতির অংশীদারও হয়েছে। হিন্দু আচার-আচরণ, রীতিনীতিকে তারা যতই তাদের জীবনচর্যা বা সংস্কৃতিতে অঙ্গীভূত করেছে, ততই সম্পূর্ণ জাতি হিসাবে সচেতন হয়ে উঠেছে এবং নিজেদের জাতিসত্তার নৃ-তাত্ত্বিক অন্বেষণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় থেকেছে। কারণ সময়ের স্রোতে বিষয়টি আরোপিত হয়েছে। অনেকের মতে, রাজবংশী জনগোষ্ঠী ইন্দো-মঙ্গোলীয় নৃ-শাখা গোষ্ঠী নয়, দ্রাবিড় বা অষ্ট্রিক নৃ-গোষ্ঠীর শাখা। আবার কারও মতে, মিশ্র সংকর জাতি, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় প্রভাবও রয়েছে। তবে উত্তর-পূর্ব ভারতে সুদীর্ঘকাল মঙ্গোলীয় সংস্কৃতির আধিপত্য ছিল, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সঙ্গে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সাদৃশ্য থাকলেও খাদ্যাভ্যাস, ভাষারীতি, আচার-বিশ্বাসে মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্যেরই প্রাধান্য। আর দ্রাবিড়ীয় মিশ্রণও ঘটে অনেক পরে; কারণ আর্য, দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক সভ্যতার মিলন পরবর্তী কালের এক ধারাবাহিক প্রবাহ। আর্য সভ্যতার ঢেউও সিন্ধু উপত্যকা থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় পৌঁছতে বেশ সময় লেগেছিল।

রাজবংশী জাতির উৎপত্তি নিয়ে গবেষক, পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন মতামত উঠে আসে। ফ্রান্সিস হ্যামিলটন বুকাননই প্রথম ব্যক্তি, যিনি (১৮০৭-১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে) উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী নিয়ে তথ্যানুসন্ধান চালিয়েছেন। তাঁর মতে অধিকাংশ রাজবংশীই কোচ এবং একই বংশোদ্ভূত। আর কোচ জাতিই বর্তমান রাজবংশীর পূর্বপুরুষ।[৩] পরবর্তীকালে অধিকাংশ গবেষকই ফ্রান্সিস বুকাননের মতামত গ্রহণ করে। এইচ. এইচ. রিজলের মতে কোচ, রাজবংশী, পলিয়া, দেশিয়া সমস্ত সম্প্রদায়ই একই শাখার অন্তর্ভুক্ত।[৪] এইচ. বেভারলিও

একই মন্তব্য করেন, ‘The Koch, Rajbanshi and Paliya are of the most part one the same tribes’।[৫] এ. ই. পার্টারও রিজলের মতকে সমর্থন করেছেন।[৬]

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে উইলিয়াম হান্টারও উল্লেখ করেছেন যে —

> The semi-Hinduised aborigins of the Census report, who are considerably more consist of cognate tribes of Koch Pali and Rajbanshi whose home is in the adjoing state of Kuch Behar.[৭]

১৯০৫ ও ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বি. সি. অ্যালেনের ‘Assam District Gazetteer’-এ কোচ বা রাজবংশীদের মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর আদিবাসী উপজাতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৮] ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে বি. এইচ. হজসন তাঁর ‘Essay on the Koch, Bodo and Dhimal Tribes’ শীর্ষক প্রবন্ধে রাজবংশী এবং কোচ জনগোষ্ঠীকে একই বংশোদ্ভূত এবং মঙ্গোলীয় জাতি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।[৯] পরবর্তীকালে স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন ‘Linguistic Survey of India’ (1927) গ্রন্থে এই একই মত পোষণ করেন। তাঁর মতে, কোচদের মধ্যে যারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী, তারাই রাজবংশী হিসাবে সমধিক পরিচিতি লাভ করেছে।[১০] ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ‘ভারতের আদমসুমারির বিবরণ’-এ মন্তব্য করা হয়েছে, ‘উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের জাতিগত অবস্থান বিতর্কযুক্ত হলেও বলা যায় যে তারা পূর্ব গিরিপথ ধরে আগত মঙ্গোলীয় জাতির তৃতীয় শাখার অংশ।’[১১] আবার বখ্‌তিয়ার খিলজির গৌড়, কামরূপ আক্রমণের বিবরণমূলক গ্রন্থ ‘তবকাৎ-ই-নাসিরী’তেও ‘কোচ-মেচ-থারু’ সম্প্রদায়গুলিকে মঙ্গোলীয় শাখার লোক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১২] ও’ ডোনেলও তাঁর ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারির প্রতিবেদনে বলেছেন যে রাজবংশী বা কোচদের মধ্যে মঙ্গোলীয় রক্তের প্রভাব বেশি।[১৩] রাজবংশীদের উদ্ভব সম্পর্কে ড. পিয়ের বেসাইনের মত, “তিব্বতি ও ভারতীয়দের সংমিশ্রণের ফলে রাজবংশীদের উদ্ভব। এদের কেউ কেউ কোচ উপজাতি ত্যাগ করে নাম পালটে রাজবংশী হয়ে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন।”[১৪] আবার, জে. এ. ভাসের মতানুযায়ী, রংপুরের

রাজবংশীরা কোচ জাতি থেকে উদ্ভূত এবং মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের মধ্যে দ্রাবিড়ীয় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে, উত্তরাংশে সামান্য হলেও পশ্চিমাংশে তা যথেষ্ট; আর্য রক্ত তাদের ধমনীতে প্রায় নেই বললেই চলে।[১৫] কোচবিহারের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন লিউইন ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে মন্তব্য করেন যে ভুটান ডুয়ার্সের অধিবাসী মেচ উপজাতির সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দুদের পারস্পরিক বৈবাহিক সংমিশ্রণের ফলে রাজবংশী জাতির উদ্ভব হয়েছে।[১৬] কিন্তু কোচবিহার রাজ-প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তাঁর 'The Coochbehar State and its Land Revenue Settlement' গ্রন্থে বলেছেন, রাজবংশী কখনও দুটি জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত নয়।[১৭] এ প্রসঙ্গে ও' ম্যালের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, কোচ, মেচ, বোড়ো সবাই তিব্বত-বর্মী ভাষীরা একই উপজাতীয় উৎস থেকে এসেছেন।[১৮] পরবর্তীকালে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তিনি মন্তব্য করেন, 'কোচ হতে রাজবংশী জাতি ভিন্ন' — এ-দাবি অসঙ্কোচে মঞ্জুর করা হল। জাতির উৎপত্তি বিষয়ে যতই প্রশ্ন থাকুক, আজ থেকে কোনও সন্দেহ নেই যে রাজবংশী ও কোচ পৃথক জাতি।[১৯] র‍্যালফ ফিচ, ব্রায়ান, হজসন, বুকানন প্রমুখ পরিব্রাজকের মতে কামরূপ বা কামতার অধিবাসীরা (বর্তমান কালের অসম, কোচবিহার, রংপুর, দিনাজপুর এলাকা) মঙ্গোলীয়।[২০] এডওয়ার্ড গেইটের মতেও "প্রকৃত কোচরা হল মঙ্গোলীয় এবং রাজবংশীরা সম্পূর্ণ আলাদা জাতি। দ্রাবিড়দের সঙ্গে এদের সংস্পর্শ আছে। প্রতিবেশীরা ছিল অসংখ্য হিন্দু। মানস নদীর পশ্চিম তীরের কোচরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করার পর রাজবংশী নাম গ্রহণ করে।"[২১] এ প্রসঙ্গে হজসন সাহেবের বক্তব্য হল — বিশ্বসিংহ হাজোর পৌত্র, কোচ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন ও রাজবংশী নামে পরিচিত হন।[২২] ওয়াড্ডেল হজসনের বক্তব্যকে সমর্থন করে তিনি বলেছেন :

> The Koches do not belong to the Dravidian stock, but are distinctly Mongoloid though some what heterogenous.[২৩]

নৃতত্ত্ববিদ হার্বার্ট রিজলিও কোচ, পলিয়া, রাজবংশীদের একই বংশোদ্ভূত জাতি হিসাবে উল্লেখ করেন। তিনি রাজবংশীদের দ্রাবিড় জাতি হিসাবে চিহ্নিত করে মঙ্গোলীয় সংমিশ্রণ ঘটেছে বলে মত প্রকাশ করেন।[২৪] বেভারলির মতেও কোচ, রাজবংশী, পলিয়া এবং দেশি —

এরা সকলেই দ্রাবিড় জাতি থেকে উদ্ভূত।[২৫] ই. টি. ডালটন কিংবা হান্টারও রাজবংশী-ক্ষত্রিয় জাতিকে দ্রাবিড় শাখার অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন।[২৬] ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রাজবংশী জাতিকে মঙ্গোলীয় নৃ-জাতির তিব্বত-ব্রহ্মদেশীয় ভাষা শাখার গোষ্ঠী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন এবং বলেছেন যে কোচেরা নিজেদের রাজবংশী হিসাবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন।[২৭]

রাজবংশী জনগোষ্ঠীর উদ্ভব নিয়ে ব্রিটিশ আধিকারিক সহ নৃতত্ত্ববিদ, গবেষক ও পণ্ডিতমহল বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। অনেকের মতে এই গোষ্ঠী দ্রাবিড়-অস্ট্রিক নৃ-গোষ্ঠীর বংশধর, কারও কারও মতে মঙ্গোলীয় নৃ-শাখার অন্তর্ভুক্ত। আবার অনেকের মতে মিশ্র-সংকর জাতি। ভারতীয় গবেষক ও পণ্ডিতদের অনেকের মতে, রাজবংশীরা কোচদের বংশজাত। আবার অনেকের মন্তব্য, রাজবংশীরা মিশ্র জাতি।[২৮] স্বাভাবিকভাবেই রাজবংশী জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি নিয়ে বিতর্ক আছে। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অব্ ইন্ডিয়া, ১৯০৮-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে কোচরা নিজেদের রাজবংশী হিসেবে পরিচয় দেয় কিন্তু তাদের এই পরিচয় সত্য নয়। দুটি জাতির উৎপত্তি সম্পূর্ণ দুটি পৃথক উৎস থেকে। কোচ রাজারা মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত, পক্ষান্তরে রাজবংশীরা দ্রাবিড় নরগোষ্ঠীর বংশধর এবং কোচ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার আগেই সম্ভবত তারা এই রাজবংশী নামটি গ্রহণ করে। কোচবিহারের অধিবাসী রাজবংশীরা দেহাকৃতির দিক থেকে যারা সুস্পষ্ট মঙ্গোলীয়ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তারা হয় বিশুদ্ধ কোচ অথবা ক্ষমতাসীন কোচদের সঙ্গে অন্য জাতির সংমিশ্রণে সংকর জাতি বিশেষ, যাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে মঙ্গোলীয়ান বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য সূচিত হয়েছে। এই রিপোর্টে রাজবংশীদের একটি অংশকে দ্রাবিড় আর একটি অংশকে মঙ্গোলিয়ান গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত বলা হয়েছে। এখানে কোচবিহার এবং রাজ্যের অধিবাসীদের পৃথক নরগোষ্ঠীর বংশধর বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

সমাজ সংস্কারক মনীষী পঞ্চানন বর্মার ক্ষাত্র-আন্দোলনের ফলে পশ্চিমবঙ্গে বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠী আজকে রাজবংশী-ক্ষত্রিয় হিসাবে চিহ্নিত এবং কোচদের তুলনায় পৃথক জনগোষ্ঠী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। ব্রিটিশ সরকারের আদমসুমারির প্রতিবেদনেও (১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ) এই ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। অসমে কোচ-রাজবংশী রূপে পরিচিত হলেও উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর রাজবংশী সমাজ রাজবংশী-ক্ষত্রিয় হিসাবে পরিচয় প্রদানেই গর্ববোধ করেন। প্রথমদিকে কোচ ও রাজবংশীদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য উল্লিখিত হলেও কোচ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা এবং ধর্মীয়, সামাজিক ও

সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে ব্যবধান দূরীভূত হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে কোচ ও রাজবংশী জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বৈবাহিক সূত্রে রক্তের সংমিশ্রণ, সাংস্কৃতিক ও ভাষার আদান-প্রদানের মাধ্যমে নতুন এক সমাজের সৃষ্টি হয়। বলা যায়, বর্তমানে রাজবংশী ও কোচদের মধ্যে প্রায় কোনও বিভেদ নেই। এ-প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'Kirata Jana Krti' গ্রন্থে বলেছেন যে কোচেরাও নিজেদের রাজবংশী হিসাবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন।[২৯] ১৯৩১ সালে আদমসুমারির প্রতিবেদনে ডব্লিউ. এইচ. থমসন মন্তব্য করেছেন :

> Rajbanshis are the indigenous people of Northern Bengal and the third largest Hindu Caste in the Province. In 1901, many Koches in North Bengal were returned as Rajbanshis and many of the Rajbanshis have taken sacred thread and were prepared to use force in support of their claim to be returned as Kshatriya.[৩০]

পণ্ডিত ও গবেষক মহলের মধ্যে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন মতামত থাকলেও অনেকেই (জে. এ. ভাস, ই. এ. গেইট, র‍্যালফ ফিচ, ব্রায়ান, হজসন, বুকানন, বি. সি. অ্যালেন, ওয়াড্ডেল, ও' ডোনেল প্রমুখ) রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে মঙ্গোলীয় নৃ-গোষ্ঠীর জনপ্রবাহ হিসাবেই আখ্যায়িত করেছেন। এছাড়া হিমালয়ের পাদদেশ সহ উত্তর-পূর্ব ভারত, মায়ানমার, নেপালের মঙ্গোলীয় নৃ-শাখার মানুষের সঙ্গে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। পরবর্তীতে, কালের স্রোতে এই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অষ্ট্রিক, প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটে। তা সত্ত্বেও গবেষকদের অধিকাংশের মতে রাজবংশীদের মধ্যে মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্যেরই প্রাধান্য এবং বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠী ইন্দো-মঙ্গোলীয় জাতির বৃহত্তর বোড়ো গোষ্ঠীর অন্যতম একটি শাখা। এসব নানা মন্তব্যে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক উৎসগত বিষয়টিও বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। তবে আধুনিক গবেষক, পণ্ডিত ও সমাজতাত্ত্বিকদের সকলেই একমত যে রাজবংশী জনগোষ্ঠী ইন্দো-মঙ্গোলীয় জনজাতিরই একটি শক্তিশালী শাখা।

কোচ ও রাজবংশী — এই শব্দ দুটি নিয়েও বিভ্রান্তি আছে। বিশেষ করে রাজবংশী-ক্ষত্রিয় সমাজ কোচদের তুলনায় ভিন্ন এবং উন্নত হিসাবে প্রতিপন্ন করতে পছন্দ করেন। উৎপত্তি বিষয়েও তারা ভিন্ন মতের অনুসারী। তাদের মতে, রাজবংশীরা বরাবরই ক্ষত্রিয় ছিলেন। পরবর্তীকালে তাদের পদমর্যাদার হানি ঘটে এবং তারা ভঙ্গ ক্ষত্রিয় হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। অনেক গবেষক, পণ্ডিতও এই ভাবনায় সহমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, কোচ ও রাজবংশী জনগোষ্ঠী স্বতন্ত্র, একই জনগোষ্ঠী নয়। এ-বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে 'ক্ষত্রিয় সমিতি'। রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলন সংঘটিত হয় এবং তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার আদমসুমারির রিপোর্টে (১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ) রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে পৃথক 'ক্ষত্রিয় জাতি' হিসাবে উল্লেখ করার পক্ষে সম্মতি প্রদান করেছিলেন। রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা রাজবংশী ও কোচদের পৃথক জাতিগোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করার পাশাপাশি রাজবংশীদের কোচদের থেকে উন্নত হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। রাজবংশীরা পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক আচার-আচরণ সহ শুচিতার ক্ষেত্রে পৃথক সত্তার পরিচয় বহন করে। সেই সঙ্গে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও ক্ষত্রিয়ত্ব বজায় রাখে। এ-প্রসঙ্গে হরকিশোর অধিকারী তাঁর 'রাজবংশী কুল-প্রদীপ' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে বলেছেন যে —

> ... The Koches and the Rajbanshis were not the same caste and were different in many ways. The food habits, behaviour and the upper caste Hindu, including the Rajbanshis did not maintain social relations with them.

তিনি আরও বলেছেন যে রাজবংশীরা ধর্মীয় দিক থেকে ভিন্ন থাকলেও পূর্বাপর ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁর মতে —

> "Koches adopted Hinduism during the reign of Maharaja Viswa Singha of Cooch Behar (in the early of 16th Century). Whereas the Rajbanshis were Hindus before the reign of

> Viswa Singha and were recognized as Bhanga Kshatriya."[৩১]

পরবর্তীকালে জলপাইগুড়ির কৃতী সন্তান ও বিশিষ্ট সমাজসেবক উপেন্দ্রনাথ বর্মন তাঁর 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস' শীর্ষক গ্রন্থে হিন্দুশাস্ত্র ও পুরাণ থেকে তথ্য উদ্ধৃত করে বলেছেন যে অষ্টাদশ শতকের অনেক পূর্বেই রাজবংশীরা ক্ষত্রিয় মর্যাদা দাবি করেছিল।[৩২] এছাড়াও মণিরাম কাব্যভূষণ সহ আরও অনেকে রাজবংশীদের 'Mythic historical claim of Kshatriyas' বলে স্বীকার করেছেন।[৩৩] আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও 'Kirata Jana Krti' গ্রন্থে বলেছেন :

> The masses of North Bengal areas are very Bodo-origin or mixed Austric-Dravidian-Mongoloid, where groups of peoples from lower Bengal (Bhati desh) and Bihar have penetrated among them. They are mainly as koch i.e. Hindu or semi Hindu Bodo who have abandoned their original Tibeto Burman speech and have adopted the northern dialect of Bengali (which has a close affinity with Assamese) and when they are a little to concious of their Hindu religion and culture and retained at the same time some vogue memory of the glories of their people particularly during the time of Viswa Singha and Naranarayan, they are proud to themselves Rajbanshis and to claim to be called Kshatriyas. [৩৪]

কোচ ও রাজবংশীদের স্বতন্ত্র গোষ্ঠী পরিচয় এবং রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্ব নিয়ে নানাবিধ

প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন গবেষক, নৃতাত্ত্বিক ও পণ্ডিতদের মধ্যে। কোচ-রাজবংশ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে রাজবংশী শব্দটির নিবিড় যোগকে স্বীকার করে নিয়েও বৃহত্তর এই জনগোষ্ঠী কোচদের থেকে নিজেদেরকে স্বতন্ত্র ভাবেন। কিন্তু ইতিহাসবিদ, পণ্ডিত-গবেষকদের মতে কোচ ও রাজবংশী শব্দ দুটির মধ্যে কোচ নামটি আদি ও প্রকৃত। পরবর্তীকালে রাজবংশী জনগোষ্ঠী সংগঠিত হয় এবং আরও কিছু জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে বৃহত্তর রাজবংশী সমাজ তৈরি হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, অসমে রাজবংশী জাতির পরিচয় কোচ-রাজবংশী নামে। তারা কোচ ঐক্যসূত্র ধরে রেখেছে। পশ্চিমবঙ্গে রাজবংশীরা 'রাজবংশী ক্ষত্রিয়' হিসাবে সমধিক পরিচিত। উৎসগত কোচ নৃতত্ত্ব সূত্রকে অস্বীকার করে স্বতন্ত্র উন্নত এবং সংকর জাতি হিসাবে নিজেদের মনে করে। কিন্তু গবেষক, পণ্ডিত, ইতিহাসবিদদের মতে কোচ জাতিসত্তার বিষয়টি আদি ও প্রকৃত, রাজবংশী পরিচয়টি অর্বাচীন এবং কোচ রাজবংশ প্রতিষ্ঠার (ষোড়শ শতকে) সঙ্গে সম্পৃক্ত। কোচ-বংশের হাজো রাজার পুত্র বিশ্বসিংহ কোচ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেই কোচ পরিচয় ত্যাগ করে 'রাজবংশী' জাতি পরিচয় গ্রহণ করেন। এছাড়া প্রাচীন শাস্ত্র, পুরাণ, উপ-পুরাণ, ধর্মীয় গ্রন্থেও রাজবংশী নামটির বিশেষ উল্লেখ নেই। একমাত্র কালিকাপুরাণ, ভ্রামরীতন্ত্রে রাজবংশী নামটি উল্লিখিত হয় প্রাথমিক ভাবে। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় পরশুরামের ভয়ে রাজবংশী ক্ষত্রিয়রা নিজ পরিচয় লুকিয়ে হিমালয়ের পাদদেশে এসে বসবাস শুরু করে এবং ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হয়।[৩৫] ষোড়শ শতাব্দীর পণ্ডিত রূপনারায়ণ রচিত 'কামতেশ্বর কুল কারিকা' থেকে জানা যায় :

ছিড়িয়া গলার দড়ি ক্ষত্র চিহ্ন লুপ্ত করি / প্রাণভয়ে ইতিউতি পালান্ত সকলি।
সংগ্রামক ভয় করি ভঙ্গক্ষত্রি নাম ধরি / আপনাকে মানে কেহ রাজবংশী বুলি।[৩৬]

প্রাচীন 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ', পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত দেবীবর মিশ্রের 'খেলবিধি', ধ্রুবানন্দ মিশ্রের 'কুলকারিকা' প্রভৃতি গ্রন্থে কোচ জাতির উল্লেখ আছে। সপ্তদশ শতকের 'তারিখে আসাম' ও 'আলমগীর নামা', অষ্টাদশ শতকের 'রিয়াজস সালাতিন', ঊনবিংশ শতকের 'মোরসেদ জাঁহানামা' প্রভৃতি মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিত গ্রন্থে এতদঞ্চলের অধিবাসী হিসাবে শুধুমাত্র কোচ ও মেচ জাতির উল্লেখ আছে।[৩৭] ত্রয়োদশ শতকে লিখিত মিনহাজুস সিরাজের 'তবাকাৎ-ই-নাসিরী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে তৎকালীন কামরূপ অঞ্চলে 'কোচ, মেচ, থারু' সম্প্রদায়গুলির বসবাস ছিল। এছাড়া বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে কোচ রমণীর প্রতি শিবের আসক্তির কথা বর্ণিত

হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই সময়ের কোনও গ্রন্থে রাজবংশী নামক জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় না।[৩৮] দিনাজপুরে প্রাপ্ত কম্বোজ রাজবংশের রাজা গৌড় কর্তৃক ৮৮০ শক (৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে) স্থাপিত বাণগড়, শিলালিপিতে কোচ জাতির উল্লেখ আছে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে কোচ শব্দটির সংস্কৃতায়িত রূপ 'কম্বোজ'[৩৯] এবং যোগিনীতন্ত্র ও পদ্মপুরাণে যা 'কুবাচ', 'কুবাচক' হয়েছে।[৪০] হজসনও বলেছেন যে বিশ্বসিংহ হাজোর পৌত্র, কোচ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন ও রাজবংশী নামে পরিচিত হন।[৪১] পৌরাণিক আমল, এমনকী হাজার বছরেরও প্রাচীন শিলালিপি ও পৌরাণিক গ্রন্থাবলীতে 'রাজবংশী' নামক কোনও জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় না। বুকানন হ্যামিলটনই (১৮০৭-১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে) সর্বপ্রথম কোচদের সঙ্গে একত্রিত করে 'রাজবংশী'র উল্লেখ করেন।[৪২] 'কোচবিহারের ইতিহাস' গ্রন্থে হেমন্তকুমার বর্মা 'কম্বোজ' রাজবংশ থেকে রাজবংশী নামের উদ্ভব হওয়ার কথা বলেন। মনুসংহিতায় পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রাবিড়, কম্বোজ, শক জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, কম্বোজ রাজবংশ থেকে কোচ (কম্বোজ > কুবাচ > কোচ) শব্দ এসেছে। আর কোচ জাতিই পরবর্তীকালে রাজবংশোদ্ভূত 'রাজবংশী' নাম গ্রহণ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। তৎকালীন কোচ জাতির যেসব লোকজন আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ছিলেন, তাঁরাই মহারাজা বিশ্বসিংহের অনুগামী হয়ে 'রাজবংশী' নাম গ্রহণ করে আলাদা হয়ে যান। আর যেসব লোকজন আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ও রাজার সংস্পর্শ থেকে দূরে ছিলেন, রাজার সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর স্পর্শ যাঁরা পাননি, তাঁরা আজও কোচ জাতি হিসাবে রয়ে গেছেন। এসব কারণে কোচ ও রাজবংশীদের আচার-বিশ্বাস, সংস্কার-সংস্কৃতির মধ্যে মিল থাকলেও যথেষ্ট অমিলও পরিলক্ষিত হয়।[৪৩] সাহিত্য আকাদেমির ভাষাসম্মানে ভূষিত বিশিষ্ট গবেষক গিরিজাশঙ্কর রায় তাঁর 'উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ' গ্রন্থে যুক্তি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে মত ব্যক্ত করেছেন যে কোচ ও রাজবংশী শব্দ দুটির মধ্যে কোচ নামটি আদি ও প্রকৃত।[৪৪] ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রায় সব গবেষক, ইংরেজ প্রশাসক, চিকিৎসক, ঐতিহাসিক ও নৃ-বিজ্ঞানী রাজবংশীদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে কোচ-রাজবংশের হাত ধরে কোচ নাম ত্যাগ করে 'রাজবংশী' নাম গ্রহণ করে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ক্ষত্রিয় সমিতির দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে রাজবংশীরা ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারির রিপোর্টে 'ক্ষত্রিয় জাতি' হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এই আন্দোলনের পুরোধা

পুরুষ ছিলেন রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত যে সমস্ত নৃতাত্ত্বিক গবেষক, ঔপনিবেশিক আমলের আধিকারিক, প্রশাসক, চিকিৎসক, ঐতিহাসিক ও নৃ-বিজ্ঞানী রাজবংশীদের নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই মত প্রকাশ করেছেন যে কোচ শব্দটিই আদি ও প্রকৃত এবং কোচ, রাজবংশী, পলিয়া, দেশিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায় একই শাখার লোক।[৪৫]

রাজবংশী সমাজের একটা বৃহত্তর অংশই ক্ষত্রিয় মনোভাব পোষণ করে। ইতিহাসগতভাবে তারা বিভিন্ন পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থের তথ্য সূত্র উপস্থাপন করে তাদের এই ক্ষত্রিয় পরিচয়কে তুলে ধরে। ভ্রামরী তন্ত্রের দ্বিতীয় স্তবকে বলা হয়েছে —

নন্দীসূত ভয়াদ্ভীমে পৌন্ড্রদেশাৎ সমাগতাঃ
বর্দ্ধনস্য পঞ্চপুত্রাঃ স্বর্গর্নৈর্বান্ধবৈঃ সহ।
রত্নপীঠং যিতিস্ততে কালাধিপ্রসঙ্গমাৎ
ক্ষাত্রধর্মাপদপক্রান্তা রাজবংশীতি খ্যাতাঃভূবি।।

যে নন্দী সুতের ভয়ে রাজ্যবর্ধনের পাঁচ পুত্র জ্ঞাতি বন্ধুদের নিয়ে পৌন্ড্রদেশ ত্যাগ করে কামরূপের রত্নপীঠ এলাকায় এসে বসবাস শুরু করে। দীর্ঘদিন ব্রাহ্মণ সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় ক্ষাত্রধর্ম চ্যুত হয়। পরবর্তীকালে রাজবংশী নামে পরিচিতি পায়। এই প্রেক্ষিতে রাজবংশীরা নিজেদেরকে 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়' যেমন প্রতিপন্ন করে তেমনি কালিকাপুরাণের বক্তব্যকেও গুরুত্ব দেয়। কালিকাপুরাণে পাওয়া যায় যে জামদগ্নের (পরশুরাম) ভয়ে ক্ষত্রিয়রা ভীত হয়ে ম্লেচ্ছের ছদ্মবেশে ভগবান জল্পেশ দেবের শরণাপন্ন হয় এবং ম্লেচ্ছাচারে নিজেদেরকে আড়াল করে মহাদেবের পূজা করতে থাকে।

জামদগ্ন্য ভয়াদ্ভীতাঃ ক্ষত্রিয়া পূর্বমেবহি
ম্লেচ্ছ ছদ্মানুপাদায় জল্পীশং শরণং গতাঃ।

(কালিকাপুরাণ ৩০, ৭৭ তম অধ্যায়)

এই দুই সূত্রের প্রেক্ষিতে রাজবংশীরা নিজেদেরকে ক্ষত্রিয় হিসাবে দাবি করে। অনেক পণ্ডিতের মতে কালিকাপুরাণ খ্যাত জামদগ্ন (পরশুরাম) এবং ভ্রামরীতন্ত্রে উল্লেখিত নন্দীসূত মহাপদ্মনন্দ একই ব্যক্তি। বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তব্যও এই ভাবনাকে পুষ্ট করে। বিষ্ণুপুরাণ ও

শ্রীমদ্ভাগবতে ক্ষত্রিয় নিধনকারী রাজা মহাপদ্মনন্দের কথা বলা হয়েছে এবং তিনি পরশুরামের মত ক্ষত্রিয় নিধন করে শাসন ক্ষমতার অধিকারী হন।

কামরূপের প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় রাজবংশীরা কামরূপের আদি বাসিন্দা এবং তৎকালীন কামরূপ চারটি ক্ষেত্রে বিভক্ত ছিল - কামপীঠ, যোনী পীঠ, মণিপীঠ ও রত্নপীঠ। কামরূপ রাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত জল্পেশ এলাকার বিস্তীর্ণ অংশেই রত্নপীঠের অবস্থান। যোগিনী তন্ত্রে যেমন উল্লেখ পাওয়া যায়, বুকানন হ্যামিলটনও তার রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে রত্নপীঠ অংশে রাজবংশীরা বসবাস করত। অন্যদিকে ভ্রামরীতন্ত্রে উল্লেখ আছে যে রাজবংশীরা পৌণ্ড্রভূমি থেকে এই রত্নপীঠ অংশে এসে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিবর্জিত হয়ে বসবাস করে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারও তাঁর গ্রন্থে (History of Bengal Vol - I) একথা উল্লেখ করেন। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের ৪৪ সংখ্যক শ্লোক থেকেও জানা যায় যে পৌণ্ড্র এলাকার বসবাসকারী ক্ষত্রিয়রা বৈদিক আচার অনুষ্ঠান ত্যাগ করে শূদ্রে পরিণত হয়।

শনকৈকস্তু ক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।।
পৌণ্ড্র কাশ্চৌড্র দ্রাবিড়াঃ কম্বোজাঃ যবনাঃ শকাঃ
পারদাঃ পহ্নবাশ্চীনাঃ কিরাদাঃ দশাঃ।।

বলা হয়েছে যে পৌণ্ড্র, ওড্র, দ্রাবিড়, কম্বোজ, যবন, শক, কিরাত ইত্যাদি ক্ষত্রিয়রা উপনয়নাদি সংস্কারের অভাবে এবং ব্রাহ্মণদের অদর্শনে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছে এবং মনুসংহিতার বিধান অনুযায়ী তারা স্বধর্মচ্যুত হয়। সেই প্রেক্ষিতে বলা হয় কিছু পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় মহাপদ্মনন্দের ভয়ে করতোয়া নদী পেরিয়ে জল্পেশ সন্নিকটবর্তী রত্নপীঠ এলাকায় বসবাস শুরু করে ও দীর্ঘদিন ব্রাহ্মণদের সংস্পর্শে না থাকায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয় ও ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তাদের ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বক্তব্য যুক্তি হিসাবে উঠে আসে যে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতেই সমগ্র উত্তরবঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে এবং সমগ্র অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিরোধী বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে আর্যাবতে বর্ণাশ্রম ধর্ম লোপ পেতে থাকে। বেদে চিহ্নিত যজ্ঞবিধি বিরোধী বৌদ্ধদের সঙ্গে স্বাভাবিক কারণে দেবদেবী সেবক হিন্দু বর্ণাশ্রম, ধর্মীয় ক্ষত্রিয়দের সংঘর্ষ বাধে। নিজেদের ধর্ম ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়দের কেউ কেউ

আত্মগোপন করে। পরবর্তীকালে এরাই দক্ষিণবঙ্গের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বা পোদ সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠী হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। অন্যেরা আদি বাসস্থান পরিত্যাগ করে উত্তরদিকের অরণ্যানী বেষ্টিত মঙ্গোলীয় উপজাতীয় অধ্যুষিত রত্নপীঠ বা জল্পেশ ও তার পার্শ্ববর্তী কামতাপুর বা কামরূপ অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে রাজবংশী নামে বাস করতে থাকে।[৪৬]

বহুবিধ প্রেক্ষাপটে রাজবংশী সমাজের নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিচার বিশ্লেষণে স্বাভাবিকভাবে একাধিক মতামতের উত্থাপন ঘটে। কারো মতে মঙ্গোলীয়, কারো মতে দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠী আবার কারো মতে মিশ্র সংকর জাতি হিসাবে উল্লেখিত হয়। পরবর্তীকালে দেশীয় গবেষকগণও এই মতান্তরে আবর্তিত হয়েছেন। ইংরেজ গবেষকদের এই সংক্রান্ত বিচার বিশ্লেষণে প্রধান বিতর্কটি ছিল রাজবংশী ও কোচ একই কিনা এবং রাজবংশী জাতি হিসাবে তারা কোন ধর্মীয় শ্রেণিভাগে পড়েন। তাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নিয়েই তারা বেশি ব্যাপৃত ছিলেন। স্বাভাবিকভাবে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে আসে সেটি হল বিস্তীর্ণ কামরূপ সহ তথাকথিত উত্তরবঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস কথা। কারণ ইতিহাসের উপাদান থেকেই এতদঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর যথার্থ নৃভাষ্য রচিত হতে পারে। সঠিক অর্থে উন্মোচিত হতে পারে। রাজবংশী সমাজের ও নৃগোষ্ঠীগত ও ঐতিহাসিক পরিচয়।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রাজবংশীদের মঙ্গোলীয় নৃ-জাতির তিব্বত-ব্রহ্মদেশীয় ভাষা শাখার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি এ-ও মন্তব্য করেছেন যে খ্রিস্টাব্দ গণনার সময় থেকেই অসম, পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে তিব্বত-ব্রহ্মদেশীয় ভাষা শাখার বৃহত্তর বোড়ো জাতির মেচ-কোচ-কাছারি প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি বসতি স্থাপন করে।[৪৭] এ-প্রসঙ্গে তিনি আরও মন্তব্য করেন যে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মৌর্য আমলে বাংলাদেশে আর্যীকরণের সূত্রপাত এবং গুপ্ত আমলে অর্থাৎ সপ্তম শতকে তা সম্পূর্ণ হয়।[৪৮] তাঁর মতে এই সময়ে বঙ্গদেশের উত্তরাঞ্চলে আর্যভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটে এবং রাজবংশী ক্ষত্রিয়রাও পূর্বাঞ্চলের কোনও একটি আর্যভাষা গ্রহণ করে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভাষার যে কয়েকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, তা ভাষাচার্য নির্দেশিত মাগধী প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ভাষার লক্ষণ বলা যেতে পারে।[৪৯] এ-প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণীর উল্লেখ করেন। ড. গিরিজাশংকর রায়ও মন্তব্য করেন যে, 'মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর তিব্বতী ব্রহ্মদেশীয় ভাষার সাথে পরবর্তী কালে অষ্ট্রিক দ্রাবিড় ভাষার সংমিশ্রণ

ঘটেছে।[৫০] অনেকের মতে, সপ্তম শতকে রাজবংশী ক্ষত্রিয়গণ পূর্বাঞ্চলের কোনও একটি আর্যভাষার অন্তর্গত শাখা গ্রহণ করে।

রাজবংশীদের ভাষা নিয়েও পণ্ডিত মহলে বিতর্ক আছে। অনেক ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতের মতে রাজবংশীরা বৃহত্তর বোড়ো ভাষাগোষ্ঠীর একটি সম্প্রদায় পরবর্তীকালে তারা ভিন্ন ভাষার অনুবর্তী হয়। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থে 'রাজবংশী' নামটি উল্লেখ করলেও ভাষার ক্ষেত্রে তিনি 'কামরূপী' শব্দটি ব্যবহার করেন।[৫১] স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসনই প্রথম এই ভাষার নামকরণ করেন 'রাজবংশী'। তিনি 'Linguistic Survey of India' গ্রন্থে বলেছেন :

> When we cross the river (Brahmaputra) coming from Dacca, we met a well marked form of speech in Rangpur and the districts to its North and east. It is called Rajbanshi, and while undoubtedly belonging to eastern branch has still points of difference which lead us to class it as a separate dialect.[৫২]

বিশিষ্ট সমাজ-সংস্কারক মনীষী পঞ্চানন বর্মা 'রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদ'-এর মুখপত্র 'রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'-র সম্পাদক থাকাকালীন (১৯০৫-১৯১২) উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনায় এই ভাষাকে 'কামতা-বিহারী' ভাষা হিসাবে উল্লেখ করেন। উত্তরবঙ্গের আরেক কৃতী সন্তান মনীষী পঞ্চানন বর্মার ভাবশিষ্য উপেন্দ্রনাথ বর্মন রাজবংশী ভাষার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে রাজবংশী জাতির ভাষা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত।[৫৩] পরবর্তীকালে ধর্মনারায়ণ বর্মা তাঁর 'কামতাপুরী ভাষা প্রসঙ্গ' গ্রন্থে রাজবংশী ভাষাকে 'কামতাপুরী' ভাষা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। রাজবংশী ভাষা নিয়ে এ-যাবৎ যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে। অনেকে দেশী ভাষা হিসাবে উল্লেখ করতে দ্বিধা করেন নি। অনেকে ভিন্ন ভিন্ন নামকরণের পাশাপাশি উপভাষা, বি-ভাষা হিসাবেও আখ্যায়িত করেছেন। বর্তমানেও এই ভাষা-বিতর্কের সঙ্গে নানাবিধ বিষয় ইতিহাস, ঘটনা, প্রতর্ক-বিতর্ক এমনকী রাজনৈতিক বিষয় যুক্ত

হয়ে আছে। তবে সাহিত্য আকাদেমি (ভারত সরকারের সর্বোচ্চ সাহিত্য সংগঠন) ২০১০ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজবংশী ভাষার বিশিষ্ট লেখক গিরিজাশঙ্কর রায়কে ‘রাজবংশী ভাষা’ সম্মানে ভূষিত করে। এর দু’বছর পর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১২ খ্রিস্টাব্দে ‘রাজবংশী ভাষা আকাদেমি’ গঠন করে। আবার ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ‘কামতাপুরী ভাষা আকাদেমি’ও গঠন করে। ইতোমধ্যে বহু লেখক, কবি, প্রবন্ধকার রাজবংশী ভাষায় সাহিত্য চর্চা করছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে উত্তরবঙ্গ তথা নিম্ন অসমের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে। বলা যেতে পারে রাজবংশী ভাষায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর বাংলার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিসরটি সমৃদ্ধ হচ্ছে। সেই সঙ্গে সুদীর্ঘকাল অন্তরালে থাকা একটি ভাষা আজ নব আলোকে, নব আনন্দে ও কলেবরে জাগরিত হচ্ছে। যে ভাষার সঙ্গে বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর আবেগ, অস্তিত্ব, সংস্কৃতি ও নৃ-গোষ্ঠীগত পরিচয়ও যুক্ত।

তথ্যসূত্র :

১. Chatterjee, Sunity Kumar; Kirata Jana Krti, 1951, The Asiatic Society, Kol, 1951, rept. 2011 Page - 54
২. Chatterjee, Sunity Kumar; (1926), The Origin and Development of the Bengali Language, Part - I, Calcutta, 1926, Page - 78-79
৩. Martin, Robert Montogomery; The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India, rpt. (Delhi: Cosmo Publications, 1976), p. 538
৪. Risley, Herbert Hope; The Tribes and Castes of Bengal, Vol. I, (Calcutta: Bengal Secratariat Press, 1891), p. 491
৫. Beverly, H.; Report on the Census of Bengal, (Calcutta: Bengal Secretariate Press, 1872), p. 130
৬. Porter, A. E.; Census of India, Vol. V, Part - I, (Delhi: 1931) p.473

৭. Hunter, William Wilson; A Statistical Account of Bengal, Vol. V, (London: Trubner & Co., 1872), p. 42-43

৮. B. C. Allen (ed.) Assam District Gazeteers, Vol. V, (Allahabad: The Poineer Press, 1905), p. 95-96, Assam District Gazeteers, Vol. III, (Shillong: 1906), p. 93-94

৯. Hodgson, B. H.; Essay the first on the Koch, Bodo and Dhimal Tribes, (Calcutta, Baptist Missio Press, 1887), Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XVIII, Part II, p. 704-706

১০. Grierson, G. A.; Lingnistics Survey of India, Vol. V, part-I, p. 63

১১. Donel, O; Census Report of India, Vol-III, (1891), p. 62, 262

১২. Chatterjee, Sunity Kumar; Kirata Jana Krti, (Kolkata: The Asiatic Society of India, rpt. 2007) p. 54

১৩. Donel, O; op.cit., p. 262

১৪. Bessaignet, Pierre; (ed), Social Research of East Pakistan, (Asiatic Society of Pakistan) (54), p. 152

১৫. Vass, J. A.; Eastern Bengal and Assam District Gazzetter Rangpur, p. 155.

১৬. Choudhury, H. N.; Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement, 1903 rept. (ed) N. Paul, p. 126

১৭. Ibid, p. 125

১৮. দাস, অশেষকুমার; মেচ জনজাতিদের কথা, রতন বিশ্বাস সম্পাদিত ‘উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি’, (কলকাতা: পুনশ্চ, ২০০১) পৃ. ১৫৮

১৯. বর্মন, উপেন্দ্রনাথ; রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস, (জলপাইগুড়ি: ১৯৪১), পৃ. ২১-২২
L. S. S. O’Malley, Census Report of India, Vol. V, Part I, (Calcutta: Bengal Secratariat Press, 1911), p. 445

২০. বিশ্বাস, অশোক; বাংলাদেশের রাজবংশী: সমাজ ও সংস্কৃতি, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৫), পৃ: ১৩-১৪
চৌধুরী, ফকরুজ্জামান; রাজবংশী, (ঢাকা: পাকিস্তান পাবলিকেশন, ১৯৬৬, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৯)

২১. Gait, E. A.; Census of India, (Assam Volume, 1901), p. 13

২২. Hodgson, B. H.; op. cit., part II, P. VII

২৩. Laurence A. Waddell; The Tribes of the Brabmaptura Valley: A Contribution on their Physical Types and Affinities, (Nes Delhi: Logos Press, rpt. 2000), p. 48

২৪. Risley, Herbert H.; The Tribes and Caste of Bengal : Ethnographic Glossary, Vol I, (Calcutta: Bengal Secratariate Press, 1892), p. 491-92

২৫. Baverly, H.; Census of India, Vol I, Report of Bengal (1872), p. 130

২৬. Dalton, E. T.; Descriptive Ethnology of Bengal, (Delhi: rpt. 1995), p. 89-93
Hunter, W. W.; A Statistical Account of Bengal, Vol V, (1872), p. 42-43

২৭. Chatterjee, Sunity Kumar; ibid, p. 61

২৮. বর্মন, উপেন্দ্রনাথ; প্রাগুক্ত

২৯. Chatterjee, Sunity Kumar; ibid

৩০. Thomson, W. H.; Census of India, Vol V, Part I, (1931, p. 358)

৩১. অধিকারী, হরকিশোর; রাজবংশী কুল-প্রদীপ, কলিকাতা, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - ২১-২৫

৩২. বর্মন, উপেন্দ্রনাথ; প্রাগুক্ত

৩৩. মণিরাম কাব্যভূষণ, রাজবংশী ক্ষত্রিয় দীপক, (দিনাজপুর: ১৩১৮ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১-৫৫)

৩৪. Chatterjee, Sunity Kumar; Kirata Jana Krti, ibid

৩৫. পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, কালিকাপুরাণ, (১৩৪৮, ৭৭ অধ্যায়)

৩৬. শ্রুতিধর, রূপনারায়ণ; কামতেশ্বর কুল কারিকা

৩৭. খাঁ চৌধুরী, আমানতউল্লা আহমদ; কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, (কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সি, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯০), পৃ. ৪, পাদটীকা

৩৮. দত্ত রায়, বেণু; উত্তর বাংলার লোক সংগীত, (নতুন দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি, ২০০২), পৃ. ১১)

৩৯. Chatterjee, Sunity Kumar; ODBL, p. 69

৪০. Chatterji, Sunity Kumar; Kirata Jana Krti, p. 61

৪১. Hodgson, B. H.; Part II and VIII

৪২. বর্মা, হেমন্তকুমার; কোচবিহারের ইতিহাস, উদ্ধৃত 'রংপুর জেলার ইতিহাস', পৃ. ৮২-১০৬

৪৩. বিশ্বাস, অশোক; প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৪৪. রায়, গিরিজাশঙ্কর; উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয়দের পূজা-পার্বণ, (শিলিগুড়ি: এন. এল. পাবলিকেশন), ডিব্রুগড়, অসম, পৃষ্ঠা - XXI

৪৫. Risley, Herbert H.; The Tribes and Caste of Bengal : Ethnographic Glossary, Vol I, (Calcutta: Bengal Secratariate Press, 1891), p. 491

Census of India, 1931, Vol - V, Part - I, Page - 473

Bukanan, Dr. F. Hamilton; Account of the District or Zilla of Rangpur, 1810, India office Library, M.S.S.E.U.R.S.; Page - 46-47

৪৬. বর্মা, সুখবিলাস; রাজবংশী সমাজের আত্মপরিচয়, ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, ইছামুদ্দিন সরকার (সম্পা) এন. এল. পাবলিশার্স, ডিব্রুগড়, অসম, ২০০২, পৃষ্ঠা - ১৬৩

৪৭. Chatterjee, Sunity Kumar; ODBL, Part I, (1926) p. 69

৪৮. Ibid, p. 69

৪৯. Ibid, p. 78-79

৫০. Ibid, p. 69

৫১. Chatterjee, Sunity Kumar; ibid

৫২. Grierson, A; ibid, Vol. I, Part I, (Calcutta, rpt., 1963, p. 153)

৫৩. বর্মন, উপেন্দ্রনাথ; প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-১০